¯úU : `w¶Y-cwðgvÂj

cwj‡ki bvUK

µmdvqvi 4 gv‡m wbnZ 20

ঘটনা-১ : ২১ মে রাত সাড়ে ৩টা। পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির বিভাগীয় প্রধান ও সামরিক শাখার কমান্ডার আব্দুর রশিদ তাপুকে নিয়ে অস্ত্র উদ্ধারের অভিযানে নামে রূপসা থানার পুলিশ। তারা রূপসা ও বাগেরহাটের ফকিরহাট উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকা কালিগঙ্গা খালপাড়ে পৌঁছলে ননিয়ার বিল থেকে রশিদের সহযোগীরা আচমকা পুলিশের ওপর গুলিবর্ষণ শুরু করে। বিপদ বুঝে পুলিশও পাল্টা আক্রমণ করে। সুযোগ বুঝে তাপু পুলিশের গাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় ক্রসফায়ারে তার মৃত্যু হয়।

ঘটনা-২ : ২৯ আগস্ট। খুলনার বহুল আলোচিত হাজিবাড়ির বাসিন্দাদের মাঝে ব্যাপক উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। বিচলিত ঐ পরিবারের আত্মীয়স্বজনরাও। ব্যতিব্যস্ত গোটা খুলনা বিভাগে কর্মরত সংবাদকর্মীরাও। সর্বত্র একটি থমথমে গুমোট ভাব। এর কারণ, সকাল থেকেই প্রচার হয়ে যায় খুলনার শীর্ষ সন্ত্রাসী, সাংবাদিক শামছুর রহমান হত্যা মামলার চার্জশিটভুক্তসহ অন্তত ২০টি মামলার আসামি, বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্রের মালিক আসাদুজ্জামান লিটু পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। কিন্তু রাত অবধি এ ব্যাপারে কেউ নিশ্চিত হতে পারছিলেন না। পুলিশ এ ব্যাপারে মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকে। তবে এক পর্যায়ে নিশ্চিত হয়ে যায় লিটুর পরিবার। সঙ্গে সঙ্গে লিটুর স্ত্রী সাবিনা জামান শম্পা ও ছোট মেয়ে স্নেহা জামান ছুটে আসেন প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের কাছে। উৎকণ্ঠিত শম্পা সাংবাদিকদের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীসহ প্রশাসনের কাছে আকুতি জানান, তার স্বামীর যেন ক্রসফায়ারে মৃত্যু না হয়। তিনি বলেন, লিটু যদি কোনো অপরাধ করে থাকে, তাহলে যেন প্রচলিত আইনে তার বিচার করা হয়।

ঘটনা-৩ : ৩০ আগস্ট সকাল। ঘুম থেকে উঠেই সবাই যে খবরটি জানতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন তাহলো- লিটুর কী অবস্থা। কেউ কেউ রেডিও-টিভি ছেড়ে বসে। কেউ খোঁজ-খবর নিতে শুরু করে বিভিন্ন মাধ্যমে। তবে খুব বেশি কষ্ট করতে হয়নি তাদের। সকালে সবাই জেনে যায় আসাদুজ্জামান লিটু রাতেই ক্রসফায়ারে নিহত হয়েছে। পুলিশ জানায়, লিটুকে নিয়ে তারা অস্ত্র উদ্ধার করতে গেলে তার সহযোগীরা পুলিশের ওপর হামলা করলে পুলিশও পাল্টা জবাব দেয়। এ সময় লিটু গাড়ি থেকে নেমে পালানোর চেষ্টা করলে ক্রসফায়ারে সে নিহত হয়। লিটুর স্ত্রী-কন্যার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় কোনো কাজ হয়নি। শেষ পর্যন্ত ক্রসফায়ারেই তার মৃত্যু হয়।

শুধু লিটু ও তাপুই নয়, গত ৪ মাসে দেশের অপরাধপ্রবণ ও চরমপন্থিকবলিত দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে এভাবে পুলিশ হেফাজতে অন্তত ২০ জন নিহত হয়েছে, যাদের সবাই শীর্ষ পর্যায়ের সন্ত্রাসী। এদের প্রত্যেকের হত্যাকান্ডকেই পুলিশ ক্রসফায়ারে বা গণপিটুনিতে নিহত হয়েছে বলে জানায়। কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। অন্তত সার্বিক বিষয় বিচার-বিশ্লেষণ করলে তাই দাঁড়ায়।

পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির বিভাগীয় প্রধান আব্দুর রশিদ তাপুকে ঢাকার কাফরুল থানার ইব্রাহিমপুর এলাকা থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ঐ দিন পুলিশের কড়া প্রহরায় রাত ১টায় তাকে খুলনা আনা হয়। যৌথবাহিনীর সদস্যরা রাত ৩টা পর্যন্ত তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এরপর পুলিশের ভাষায়, তাপুর স্বীকারোক্তি অনুযায়ী তাকে নিয়ে অস্ত্র উদ্ধারে বের হলে তার সহযোগীরা পুলিশের ওপর হামলা চালায়। এ সময় তাপু পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে ক্রসফায়ারে নিহত হয়। প্রথম প্রথম পুলিশের এ ধরনের গল্প সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করতো। কিন্তু মাত্র ৪ মাসের ব্যবধানে পুলিশ একই গল্প অন্তত ২০ বার মঞ্চস্থ করায় এখন তা আর কেউ বিশ্বাসও করেন না। তাপু নিহত হওয়ার পর দলের সম্পাদক মোফাখখার চৌধুরী ঐদিনই পত্রপত্রিকায় ফ্যাক্স করে বলেছিলেন, ক্রসফায়ার নয়, তাকে ঢাকাতেই গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এরপর খুলনায় লাশ এনে প্রচার করা হয় ক্রসফায়ারে সে নিহত হয়েছে। মোফাখখার চৌধুরীর এ কথায় তখন কেউ তেমন একটা পাত্তা দেয়নি, কিন্তু এখন দিচ্ছে। পুলিশ হেফাজতে শীর্ষ ২০ সন্ত্রাসীর একইভাবে মৃত্যু হওয়ায় মানুষ তা বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছে।

তাপু কাহিনীর রেশ কাটতে না কাটতেই ২৮ মে বাগেরহাটের পুলিশ একই ধরনের আরেকটি ক্রসফায়ার নাটক মঞ্চস্থ করে। বাগেরহাট সদরের আড়পাড়া গ্রামের সাদেক আলীর ছেলে চরমপন্থি খায়রুল আলম স্বপনকে পুলিশ ২৬ মে ঢাকার মিরপুর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে। পরদিন তাকে বাগেরহাট আনা হয়। অতঃপর মঞ্চস্থ হয় সেই পুরনো নাটক। বলা হয়, রাতে পুলিশ তাকে নিয়ে ফকিরহাটের সোনাখালী এলাকায় অস্ত্র উদ্ধারে গেলে তার সহযোগীরা অকস্মাৎ পুলিশের ওপর হামলা চালায় এবং স্বপনকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। এ সময় দু'পক্ষের মধ্যে গুলিবিনিময় শুরু হলে ক্রসফায়ারে স্বপন নিহত হয়। এর একদিন পর ২৯ মে আরো একটি ক্রসফায়ারের ঘটনা ঘটে খুলনায়। ২৬ মে পুলিশের ওপর বোমা হামলার অভিযোগে পুলিশ আব্দুর রহমান ওরফে পনির নামে এক

সাংবাদিক শামছুর রহমান হত্যা মামলার চার্জশিটভুক্তসহ অন্তত ২০টি মামলার আসামি, বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্রের মালিক আসাদুজ্জামান লিটু পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। কিন্তু রাত অবধি এ ব্যাপারে কেউ নিশ্চিত হতে পারছিলেন না। পুলিশ এ ব্যাপারে মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকে। তবে এক পর্যায়ে নিশ্চিত হয়ে যায় লিটুর পরিবার। সঙ্গে সঙ্গে লিটুর স্ত্রী সাবিনা জামান শম্পা ও ছোট মেয়ে স্নেহা জামান ছুটে আসেন প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের কাছে। উৎকণ্ঠিত শম্পা সাংবাদিকদের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীসহ প্রশাসনের কাছে আকুতি জানান, তার স্বামীর যেন ক্রসফায়ারে মৃত্যু না হয়

চরমপন্থিকে গ্রেপ্তার করে। ২৮ মে রাত ২টার দিকে পুলিশ তাকে নিয়ে কাস্টমস ঘাট এলাকায় গেলে সে ক্রসফায়ারে নিহত ও বেশ কয়েকজন পুলিশ আহত হয় বলে পুলিশ দাবি করে। বলা হয়, কাস্টমস ঘাট এলাকায় অভিযান চলাকালে পনিরের লোকজন পুলিশের ওপর হামলা চালায়। এ সময় দু'পক্ষের মধ্যে গুলিবর্ষণ শুরু হলে ক্রসফায়ারে পনির মারা যায়। গত ৪ মাসে ঠিক এ ধরনের ২০টি গল্প শুনেছে দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ। কিন্তু ভয়ে কেউ প্রতিবাদ করতে পারেনি। প্রথম প্রতিবাদটি করেন ঠিক একইভাবে খুলনায় নিহত রাজা চৌধুরী নামে এক কিশোর সন্ত্রাসীর মা রাজিয়া বেগম। খুলনা সিটি মেয়রের গাড়িবহর ও পুলিশ সার্জেন্টের ওপর বোমা হামলাসহ ৯টি মামলার আসামি কিশোর অপরাধী রাজা চৌধুরীকে পুলিশ আটক করে ৯ জুন। এরপর পুলিশ দাবি করে জিজ্ঞাসাবাদে রাজা চৌধুরী তার কাছে অস্ত্র ও বোমা থাকার কথা স্বীকার করলে তাকে নগরীর ৫ নম্বর ঘাট এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। রাত পৌনে ৪টার দিকে তারা ঘাট এলাকায় পৌঁছলে রাজার সহযোগীরা তাদের ওপর আক্রমণ করে। এ সময় পুলিশ পাল্টা গুলি চালাতে থাকলে এক পর্যায়ে রাজা চৌধুরী দৌড়ে পালিয়ে যায়। এ সময় ক্রসফায়ারে সে নিহত হয়। কিন্তু পুলিশের কথার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে রাজার স্বজনরা বলেন, ক্রসফায়ারে নয়, পুলিশই রাজা চৌধুরীকে গুলি করে হত্যা করেছে। রাজার চাচা মাহমুদ চৌধুরী সাংবাদিকদের জানান, রাত ৩টার পর খুলনা থানার অভ্যন্তরে রাজাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। কারণ রাত ৩টা পর্যন্ত তারা থানাতেই ছিলেন। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, পুলিশ কেন আসামি ধরে তাদের হত্যা করবে? এর জবাব অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা গেছে, পুলিশ পরিকল্পিতভাবেই এ কাজটি করছে। এর মূল উদ্দেশ্য দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলকে চরমপন্থি-সন্ত্রাসীদের কবল থেকে রক্ষা করা। আর এর সঙ্গে পারিপার্শ্বিক আরো বেশ কিছু বিষয় জড়িয়ে রয়েছে। যার অন্যতম একটি শীর্ষ সন্ত্রাসীদের গডফাদারদের রক্ষা করা। প্রথমটির লক্ষ্য এখনো বাস্তবায়ন না হলেও দ্বিতীয়টি ইতিমধ্যেই অনেকটা সফল হয়েছে। কারণ লিটু কথিত ক্রসফায়ারে নিহত হওয়ার কারণে সাংবাদিক শামছুর রহমান হত্যাসহ অন্তত ২০টি মামলার ক্লু উদ্‌ঘাটনের সব সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেছে। একই অবস্থা হয়েছে সাংবাদিক মানিক সাহা ও হুমায়ুন কবীর বালু হত্যা মামলার ক্ষেত্রেও। এ মামলার অন্যতম আসামি বিডিআর আলতাফ পুলিশের দাবি অনুযায়ী তাদের সঙ্গে

ক্রসফায়ার নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার আগে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে প্রায়ই সন্ত্রাসী-চমরপন্থি ধরা পড়লে তাদের হাত-পা ভেঙে দেয়াসহ চোখ তুলে নেয়ার ঘটনা ঘটতো। ঐ সময় পুলিশ বলতো, বিক্ষুব্ধ জনতাই ঐ সমস্ত সন্ত্রাসীদের ওপর হামলা করে তাদের হাত-পা ভেঙে দিয়েছে অথবা চোখ তুলে নিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে কাজটি করতো পুলিশ। মূলত আজকের ক্রসফায়ারের নাটক মঞ্চস্থ করার প্রাথমিক ক্ষেত্রটি তারা এখান থেকেই রিহার্সেলের মাধ্যমে পাকাপোক্ত করে নেয়

বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয়েছে ২০ আগস্ট। পাইকগাছার মালত গ্রামে পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধের পর অপর এক সঙ্গীসহ সে নিহত হয়। সূত্রগুলো বলছে, এসব হত্যাকান্ড ঘটছে উপর মহলের নির্দেশেই। আর সে কারণে বারবার একই ধরনের ঘটনা ঘটলেও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ পুলিশের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। সূত্রটির দাবি, ক্রসফায়ার নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার আগে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে প্রায়ই সন্ত্রাসী-চমরপন্থি ধরা পড়লে তাদের হাত-পা ভেঙে দেয়াসহ চোখ তুলে নেয়ার ঘটনা ঘটতো। ঐ সময় পুলিশ বলতো, বিক্ষুব্ধ জনতাই ঐ সমস্ত সন্ত্রাসীদের ওপর হামলা করে তাদের হাত-পা ভেঙে দিয়েছে অথবা চোখ তুলে নিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে কাজটি করতো পুলিশ। মূলত আজকের ক্রসফায়ারের নাটক মঞ্চস্থ করার প্রাথমিক ক্ষেত্রটি তারা এখান থেকেই রিহার্সেলের মাধ্যমে পাকাপোক্ত করে নেয়। বলছে, কোনো চক্রের একজন ধরা পড়লে স্বাভাবিকভাবেই অন্যরা ডেরা ছেড়ে আত্মগোপন করে। অথচ পুলিশ প্রচার করছে ধৃত সন্ত্রাসীর স্বীকারোক্তি অনুযায়ী অস্ত্র উদ্ধারের জন্য অভিযান চালাতে গেলে তার সহযোগীরা পুলিশের ওপর হামলা চালায়। এ সময় ধৃত সন্ত্রাসী পালানোর চেষ্টা করলে ক্রসফায়ারে সে নিহত হয়- পুলিশের হেফাজতে নিহত সব সন্ত্রাসীর মৃত্যুর কারণ পুলিশের বক্তব্য অনুযায়ী থাকে একই। এ বক্তব্য কতটুকু গ্রহণযোগ্য? একটি ব্যাপার হচ্ছে আর তাহলো, পুলিশ ধৃত সন্ত্রাসীকে নিয়ে অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে গেলে নিশ্চয় তাকে জামাই আদরে নিয়ে যায় না। যতদূর জানা যায়, হাত ও চোখ বেঁধেই তাদের নিয়ে যাওয়া হয়। তাহলে হাত ও চোখ বাঁধা একজন মানুষ কীভাবে পালায়? তাছাড়া যেখানে অব্যাহতভাবে ক্রসফায়ারের ঘটনা ঘটছে, সেখানে লিটুর মতো একজন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী এমন বোকার মতো কাজ করবে কেন? আমাদের অতি পারঙ্গম পুলিশ বাহিনী এ কথা বিশ্বাস করলেও আমজনতা তা করে না। আর করে না বলেই তারা বলছে ক্রসফায়ারে নয়, লিটুকে রাত ৩টার দিকে সোনাডাঙ্গা বাইপাস সড়কে এনে খুব কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী একজন নাম প্রকাশ না করার শর্তে খুলনার সাংবাদিকদের বলেছেন, লিটুকে আনা হয় চোখ বেঁধে। তারপর গাড়ি থেকে নামিয়ে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়। তারপর পুলিশ ধর ধর বলে নিজেরা চেঁচামেচি আর গুলি ছুঁড়তে থাকে। সকালে যথারীতি প্রচার করা হয় লিটুর সহযোগীদের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধের সময় ক্রসফায়ারেই সে নিহত হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে ধৃত সন্ত্রাসীদের হামলা নিয়েও। আসাদুজ্জামান লিটু গোটা দক্ষিণাঞ্চলেই শীর্ষ পর্যায়ের একজন সন্ত্রাসী। তার অসংখ্য বাহিনী, অস্ত্রশস্ত্র আর লোকবল রয়েছে। তাহলে খুলনার পুলিশের সঙ্গে তাদের শুধু সোনাডাঙ্গা এলাকাতেই যুদ্ধ হলো কেন? গভীর রাতে পুলিশ যে তাকে নিয়ে সোনাডাঙ্গা বাইপাস সড়কের পাশে যাবে তা কী করে জানলো তারা? তাদের নেটওয়ার্ক যদি এতোই শক্তিশালী হয়, তাহলে সন্ধ্যা পর্যন্ত লিটুর স্ত্রীকে তার স্বামী গ্রেপ্তার হয়েছে কি না বিষয়ে সন্দেহের মধ্যে থাকতে হতো না। সবচেয়ে বড় কথা, সামান্য আহত লিটুকে প্রথমে আটক করেছিল নওয়াপাড়ায় সিডল টেক্সটাইল মিলের নাইট-গার্ডরা। সেখান থেকেই অভয়নগর থানার পুলিশ তাকে আটক করে। তখন নিশ্চয় লিটুর সহযোগীরা তাকে ছাড়িয়ে নিতে পারতো? কিন্তু তা পারেনি। কারণ তারা লিটুর অবস্থান জানতো না। আর বাস্তবে ঐ রাতেও লিটুর কোনো সহযোগীর সঙ্গে পুলিশের যুদ্ধ হয়নি। কারণ পালের গোদা ধরা পড়লে চ্যালাচামুন্ডারা থাকে না, পালিয়ে যায়। আর আমাদের করিৎকর্মা পুলিশ বাহিনীর সদস্যরাও যে বিষয়টি জানেন না তা নয়। তারাও জানেন এবং বোঝেন। বুঝেশুনেই তারা একের পর এক হাস্যকর গল্প বলে রেহাই পাচ্ছে।